তৃতীয় সাক্ষাৎকার
২৭ জানুয়ারি ২০১৭, আদাবর, ঢাকা
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: জান্নাতুল মরিয়ম তানিয়া ও গোলাম মুর্শেদ

প্রশ্ন: আপনি কি স্কুলজীবনেই রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়েছিলেন?

আবদুস সালাম: প্রথমে যুক্ত হয়েছিলাম অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশনে। তখন সেটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। আর তখনও কমিউনিস্ট পার্টি (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিআই) ভাগ হয়নি।

প্রশ্ন: পরে যখন রাজশাহীতে গেলেন, সেখানেও কি ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলেন?

আবদুস সালাম: রাজশাহীতে শুরুতে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক হয়েছিলাম। তারপরই ছাত্র ইউনিয়ন ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটি ছিল মতিয়ার গ্রুপ, আরেকটি মেননের। (১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন আদর্শিক সংঘাতের কারণে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়।)

প্রশ্ন: আপনি কোন গ্রুপে ছিলেন?

আবদুস সালাম: আমি কোনো গ্রুপেই যাইনি। কারণে সে সময় (পার্টি, রাজনীতি, মার্কসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে) পড়াশোনা করে ধারণা হলো, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে কায়দায় গড়ে উঠেছে, যে কায়দায় কাজ করেছে, যে প্রোগ্রামগুলো নিয়েছে সেগুলো যথাযথ হয়নি। মার্কসিস্ট ওয়েতে (মার্কসবাদী ধরনে) হয়নি। যেহেতু মার্কসিস্ট ধরন অনুযায়ী হয়নি, তাই আমি কোনো গ্রুপেই যোগ দিইনি। যদিও অনেকে আমাকে তাদের গ্রুপে টানার চেষ্টা করেছিল। আর ওই সময় যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টিই ভাগ হয়ে গেল, তাই আমি আর কোনোটাতেই গেলাম না।

প্রশ্ন: সে সময় তো আপনি কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাই না?

আবদুস সালাম: হ্যাঁ আমি তখন কলেজে পড়তাম। কলেজে পড়বার সময়ই আমরা 'মার্কসবাদী লেখক সংঘ' কমিউনিস্ট পার্টি বিষয়ে এক ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। আমাদের বক্তব্য ছিল যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলতে যা আছে, সেটা পূর্ণাঙ্গ পার্টি নয়। এর মধ্যে কমবেশি ডিমেরিটস (ত্রুটিবিচ্যুতি) আছে। যেসব আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে একটি পার্টি গড়ে উঠতে পারে সেগুলোর অনুপস্থিতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন: উচ্চ মাধ্যমিকে পড়বার সময় আপনারা এ ধরনের যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, সেগুলোর কোনো সংকলন বা লিখিত রূপ ছিল?

আবদুস সালাম: হুঁ, নিশ্চয়ই ছিল। আমরা (বক্তব্যের) সংকলন করেছিলাম। লিখিত বক্তব্যও উপস্থাপন করেছিলাম। আমাদের সংগঠনের নাম ছিল মার্কসবাদী লেখক সংঘ। এটির মুখপত্র ছিল "লালপুব"। লালপুবে আমরা আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য, মানে পূর্ব বাঙলার জনগণের মুক্তির সংগ্রামের প্রোগ্রামটা (কর্মসূচিটা), উপস্থাপন করেছিলাম।

প্রশ্ন: সেটা কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল?

আবদুস সালাম: ১৯৬৯ সালে পত্রিকাটা প্রকাশিত হয়। তবে আমাদের পর্যালোচনা ও বক্তব্য নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে থেকে শুরু হয়ে ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে। পরে সেগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন: ১৯৬৫ সাল থেকে আপনারা (মার্কসবাদী লেখক সংঘের সদস্যরা) কি কেবল নিজেরা এসব কর্মসূচির ব্যাপারে তর্কবিতর্ক ও আলোচনা করছিলেন, নাকি বাইরেও ছড়াচ্ছিলেন?

আবদুস সালাম: আমরা তখন নানা সংগঠনের ভেতরে কাজ করেছি। গণমুখ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, প্রগতিশীল ছাত্রমৈত্রী, ন্যাপ (মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) এবং আরো কয়েকটি সংগঠনে কাজ করেছি।

প্রশ্ন: ওই সব পার্টি বা গ্রুপে কি আপনারা 'মার্কসবাদী লেখক সংঘের' নামেই এসব করছিলেন?

আবদুস সালাম : আমরা মার্কসবাদী লেখক সংঘ নামে খুব বেশি পরিচিত ছিলাম না। পরিচিত ছিলাম মাইতি গ্রুপ হিসেবে। [গ্রুপের প্রধান নেতা আবদুল মালেকের ছদ্মনাম ছিল মাইতি।]

প্রশ্ন: কলেজের (উচ্চমাধ্যমিক) পড়াশোনা শেষ করলেন কবে? এরপর রাজনৈতিক তৎপরতার কী হলো?

আবদুস সালাম: ১৯৬৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করি। তারপর আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলাম বিপ্লব করতে। পূর্ব বাংলা স্বাধীন করতে। আমাদের তৎপরতা ছিল মূলত চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে। চট্টগ্রামের পার্বত্য আঞ্চলে কিছু কাজ ছিল। ঢাকায় জোনাকি হলের আশেপাশে আমাদের কিছু কাজ ছিল। সেটাই তো মাও রিসার্চ কেন্দ্র করল সিরাজ শিকদার!

প্রশ্ন: সিরাজ শিকদারের যাদের নিয়ে দল গড়লেন তাদের মধ্যে কি আপনাদের গ্রুপের কেউ ছিলেন?

আবদুস সালাম: না, তাদের দলের সঙ্গে আমাদের কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু তাদের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে, কথা হয়েছে। সিরাজ শিকদারের সাথে কয়েক দফায় আমরা বসেছি। কিন্তু তাদের বক্তব্যের সাথে আমরা একমত হতে পারিনি। বরং কিছুটা একমত হতে পেরেছিলাম ডা: দাহার ভাইদের সঙ্গে। সে সময় ডা. সইফ উদ দাহার, ডা মারুফ হোসেন এবং কাজী ফারুক আহমেদ ওই গ্রুপের নেতৃত্ব দিতেন।

প্রশ্ন: তো সিরাজ শিকদারদের গ্রুপের কোন বিষয়গুলোকে আপনাদের কাছে দুর্বলতা বলে মনে হয়েছিল?

আবদুস সালাম: প্রথমত জনগণকে প্রস্তুত না করে সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়াটাকে আমরা সঠিক বলে মনে করিনি।

প্রশ্ন: কিন্তু আপনারাও তো ততদিনে দেশ স্বাধীনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী দিয়েছিলেন?

আবদুস সালাম: হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। কিন্তু তা ছিল এমন যে জনগণ প্রস্তুত হয়ে নিজেরাই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করবে। পরিস্থিতিটাই এমন হয়ে উঠবে যে জনগণ নিজেরাই প্রস্তুত হয়ে উঠবে, নিজেরাই বাহিনী গঠন করবে এবং তারাই নেতৃত্ব দিবে। সেটাকে কোয়র্ডিনেট (সমন্বয়) করা, নেতৃত্ব দেওয়া হবে রাজনৈতিক নেতাদের কাজ। যেটা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হয়েছে। আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেছিলাম আগামী দিনের জন্য।

দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল 'শ্রেণি শত্রু হত্যার' নামে 'ব্যক্তি হত্যাকে' আমরা অনুমোদন করিনি। ব্যক্তিকে হত্যা করে শ্রেণিআধিপত্যকে হত্যা করা যায় না। শ্রেণির আধিপত্যকে হত্যা করতে হলে শ্রেণির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক আধিপত্যকে আগে ধ্বংস করতে হয়। সেটা না করে ব্যক্তি হত্যা করে লাভ নেই। এটা এক ধরনের হঠকারিতা এবং অবশেষে শাসক শ্রেণিকেই সাহায্য করে। 'শ্রেণি শত্রু খতমের' প্রকল্প এ পর্যন্ত সেটাই করেছে।

প্রশ্ন: সে সময় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অন্যান্য বামপন্থী পার্টির যে মতামত ছিল, তা নিয়ে আপনাদের বক্তব্য বা অবস্থান কী ছিল?

আবদুস সালাম: প্রায় সব পার্টির সঙ্গেই আমাদের মতের ভিন্নতা ছিল। যেমন ধরা যাক পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কথা। তারা সে সময় বলল জাতীয় অর্থনীতি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক। এ নিয়ে বইও প্রকাশ করল। কিন্তু কয়েকদিন পরে বক্তব্য পাল্টে বলল দেশের অবস্থা আসলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-উপনিবেশিক। আমরা বলেছি জাতীয় অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী, পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী আমাদের দেশে উপনিবেশিক কায়দায় দেশ শাসন শুরু করেছিল। তাদের হাত থেকে মুক্ত হওয়াটাই হবে আমদের প্রধান কাজ। অর্থাৎ আমরা বলছিলাম, সেটাই ছিল প্রধান দ্বন্দ্ব। মানে শ্রেণি শত্রু খতমের লাইনটা ছিল ভুল। সেই সময় চীনপন্থী বলি বা আর যা-ই বলি, মোটামুটি সবাই বলল যে দেশের অবস্থা আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক।

প্রশ্ন: কিন্তু বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কি মনে করল?

আবদুস সালাম: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও অনেকটা তাই। তাদেরও কোনো স্পষ্ট লাইন ছিল না। তারা জাতিগত রূপান্তরের কথা বলল।

প্রশ্ন: এরপর যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, তখন আপনারা কী করলেন?

আমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের এলাকা ছিল তানোর, গোদাগাড়ি, নাচোল, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট, পবা – মূলত বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলটা।

প্রশ্ন: এই অঞ্চলে আপনারা আপনারা কি বিশেষ বাহিনী গঠন করেছিলেন?

আবদুস সালাম: হ্যাঁ। সে সময় আমরা বাহিনী গঠন করলাম। মুক্তিফৌজের সঙ্গে কোয়পারেশন (সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথভাবে কাজ) করলাম। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো গণ্ডগোল হয়নি। কারণ তাদের লক্ষ্য আমাদের লক্ষ্য ছিল এক। (স্বার্থ সংক্রান্ত কারণেও) তাদের সঙ্গে আমরা কোনো সংঘর্ষে যাই নি। আমরা আমাদের নিজেদের এলাকায় সিভিল প্রশাসন চালু করেছিলাম। যেটা অন্যেরা করতে পারেনি। যদিও ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে এই সিভিল প্রশাসন চলে গিয়েছিল আওয়ামী লীগের হাতে।

প্রশ্ন: সে সময় আপনারা কী কারণে প্রশাসনের ওপরে আপনাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না?

আবদুস সালাম: এটা পারলাম না, কারণ ওখানে (নাটের-রাজশাহী অঞ্চলে) একাধিক গ্রুপ কাজ করছিল। আমাদের বিরোধী গ্রুপ ছিল সাম্যবাদী দল। মানে ইপিসিপিএমএল (পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট) এর একটি অংশ। আর ছিল ওহিদুর রহমানের গ্রুপ। তারা ছিল আত্রাই, রানীনগর, মান্ডা এসব অঞ্চলে। ফলে ঐ এলাকায় আমাদের প্রভাব ধরে রাখা গেল না। আমরা স্বেচ্ছায় উইথড্র (সরে এসেছিলাম) করেছিলাম।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার পর আপনাদের কর্মসূচীর কি হলো?

আবদুস সালাম: আমাদের নেতৃবৃন্দের মেজর অংশটাই মুক্তিযুদ্ধে মারা গিয়েছিল। লিডিং ক্যাডারদের (নেতৃত্বদানকারী নেতাদের) মারা গিয়েছিল মোট আটজন। লিডিং ক্যাডারদের মধ্যে বেঁচেছিলাম আমরা মাত্র তিনজন। কাজী মালেক, শহীদুল ইসলাম আর আমি। শহীদুল ইসলাম মারা গেলেন ১৯৭৪ সালে ফুড পয়েজনিংয়ে (খাদ্যবিষক্রিয়ায়)। কাজী মালেক মারা গেলেন ২০১৫ সালে। আর যেহেতু গ্রুপ ডিসম্যান্টেল (ভেঙ্গে বা ভেঙে) হয়ে গেল, আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। বলা যায় নিজেকে নতুন করে তৈরি করার কাজ শুরু করলাম।

তখনই (১৯৭৩) জাতীয় ছাত্রদল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলো। আমি তাতে যুক্ত হলাম। এটি প্রকাশ্যে ছিল ভাসানী ন্যাপের ছাত্র সংগঠন। কিন্তু এর মধ্যে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন কাজ করত, সর্বহারা পার্টির লোকেরা কাজ করত, আবার হক সাহেবের (কমরেড আবদুল হক) পার্টির (ইপিসিপিএমএল) লোকেরাও কাজ করত। আবার সাম্যবাদী দলের গ্রুপও কাজ করত।

পরে সাম্যবাদী দলের লোকেরা জাতীয় ছাত্রদল থেকে বের হয়ে গঠন করল জাতীয় ছাত্র আন্দোলন। তখন কাজী জাফরেরা করল বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন। আর মশিউর রহমান যখন ন্যাপকে নিয়ে গেল বিএনপি'র সঙ্গে, তখন আমরা জাতীয় ছাত্রদল থেকে আমাদের উইথড্র করে নিলাম। তারপর জাতীয় ছাত্রদল চলে গেল হক সাহেবদের দখলে।

এদিকে ১৯৭২-৭৩ সালের দিকে সর্বহারা পার্টির সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হয়। আমি তাদের সাথে কাজ করতে থাকি। কিন্তু সিরাজ শিকদার মারা যাওয়ার পর ওই পার্টির নেতাদের সাথে আমার মতবিরোধ বেড়ে যায়। ১৯৭৬ সালে নানাবিধ মতবিরোধের কারণে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। তারপর রাজশাহীতে ফিরে যাই।

গিয়ে গঠন করি গণতান্ত্রিক পাঠচক্র। এদিকে সাম্যবাদী দলের একটা গ্রুপ আবার বেরিয়ে এলো মাহফুজ ভূইঞার নেতৃত্বে। তাদের সাথে আমি যুক্ত হয়ে

গঠন করলাম জনমুক্তি পার্টি। জনমুক্তি পার্টি গঠনের সময় আমি বলেছিলাম একে এখনই পার্টি হিসেবে ঘোষণা না দিয়ে 'পার্টির প্রস্তুতি সংগঠন' হিসেবে দাঁড় করাতে। আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা লড়াকু অংশকে নিয়ে পার্টি হবে। কিন্তু তারা তা না করে পার্টির ঘোষণা দিয়ে দিলো, ফলে পার্টি গঠনকালে ভিন্নমত নিয়েই আমি কাজ শুরু করলাম।

অল্প কিছুদিন পরই আমাকে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলো। সময়টা ছিল ১৯৭৮ সাল। ১৯৭৮ সালে গণতান্ত্রিক পাঠচক্র আবার চালু করি, তখন সংবিধান সভা, নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সংবিধান তৈরির বিষয়টা সামনে নিয়ে আসি। ১৯৭২ সালেও আমার বক্তব্য তা-ই ছিল। সেটাই আরো জোরালো ভাবে সামনে আনলাম।

তখনই ফরহাদ মজহারের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা পার্টি, ভূমিহীন সমিতি, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নসহ সমমনা ৭/৮ টি সংগঠন মিলে একটি সংগঠন হলো। নাম ঐক্য প্রক্রিয়া। আমি সে ঐক্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলাম। এটা ছিল ১৯৮৯ সালের কথা। তখনও আমার বক্তব্য ছিল এটাকে পার্টি না করে, পার্টি গড়ে তোলার প্রস্তুতি সংগঠন করা হোক। প্রস্তুতি সংগঠনের লোকেরা বিভিন্ন গণসংগঠনে কাজ করবে। তারপর ঐ গণসংগঠনের নেতাদের নিয়ে গঠিত হবে পার্টি। অথচ সেখানেও অধিকাংশ ব্যক্তি আমার সঙ্গে একমত হলেন না। তাঁরা ৮-দফা কর্মসূচী ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'ঐক্য প্রক্রিয়াকে' একটি পার্টি ঘোষণা করল।

আমি ঐক্য প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলাম। পরে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় ঐক্য প্রক্রিয়া, কমিউনিস্ট লীগ ও পাঁচ দল যুগপৎ আন্দোলন করল। পরে হলো বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। কিন্তু আমার কথা ছিল বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসূচী যথেষ্ট বাম ছিল না। তবুও কাজ করতে করতে একটা পর্যায় পর্যন্ত ছিলাম।

পরে এরা ১১ দল করতে গেল। তখন আমার সঙ্গে তাদের সিরিয়াস মতবিরোধ হলো। এরপরও বাম ঐক্যের স্বার্থে ১১ দলে গেলাম কতগুলো বড় দ্বিমত বা দাবি নিয়ে। ১১ দলের ১৬ দফার মধ্যে কিন্তু যুদ্ধপরাধের বিচারের

দাবি ছিল না। দাবিটা অন্তর্ভুক্ত করা যায় নাই সিপিবি'র কারণে। কারণ তখন আওয়ামী লীগ ছিল ক্ষমতায়।

প্রশ্ন: সিপিবি সেটা করতে চাইল না কেন?

আবদুস সালাম: আওয়ামী লীগ বিব্রত হবে, তাই। তারপর ১১ দল থেকেও বেরিয়ে আসলাম। ১১ দল থেকে বেরিয়ে আসার পর ঐক্য প্রক্রিয়ার নঈম জাহাঙ্গীর চলে গেল বিএনপিতে, আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন বসে গেল। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে দায়িত্ব নিতে হলো। কনভেনশন করে দলের নতুন নাম দিলাম গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি। এটা হলো ১৯৯৬ সালে।

প্রশ্ন: এরপর?

আবদুস সালাম: জোনায়েদ সাকিদের ৮ সংগঠন, মোশরেফা মিশুর ঐক্য ফোরাম, টিপু বিশ্বাসের জাতীয় গণফ্রন্ট মিলিয়ে গঠন করলাম চার বাম দল। পরে মাহবুব ভাই [বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বা বাসদ(মাহবুব)] আসলেন। গঠন করলাম পাঁচ বাম দল। এরপর বাসদ (খালেকুজ্জামান) আসলো। গঠন করলাম গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা। এর মধ্যে বাসদ আবার বেরিয়ে গিয়ে সিপিবি'র সঙ্গে জোট বাঁধল। এখনও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা আছে।

মজদুর পার্টির তৎপরতা চলাকালে এক সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে জোনায়েদ সাকির সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং (বোঝাপড়া) হলো। রাজনৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে আমাদের তেমন কোনো মতপার্থক্য ছিল না। একসঙ্গে কাজের ব্যাপারে আমি যে লিখিত প্রস্তাব বা বক্তব্য দিয়েছিলাম, জোনায়েদ সাকি সেটার সাথে পুরোপুরি একমত হওয়ার পর আমরা দুই সংগঠন এক করার জন্য একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে গেলাম। সেটা আনুষ্ঠানিক নয়, অনুষ্ঠানিক। নিচ থেকে কাজ করতে করতে অবশেষে ২০১১ সালে মজদুর পার্টি গণসংহতি আন্দোলনের সাথে এক হয়।

প্রশ্ন: এছাড়া আপনারা কি বদরুদ্দীন উমরের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগ (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বা এ ধরনের অন্যান্য পার্টির সাথেও জোট করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন?

আবদুস সালাম: না। উমর সাহেবের সঙ্গে আমি কোনোদিন (পার্টি বিষয়ে) আলোচনাতেই বসিনি। উনি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তখন তাঁর কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টা বিষয়ে আমরা নিজেরা বহু আলোচনা-পর্যালোচনা করেছি। তখন আমাদের এ আন্ডারস্যান্ডিং হয়েছিল যে (আমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে) উমর সাহেবকে দিয়ে আর যা-ই হোক কমিউনিস্ট আন্দোলন হবে না।

প্রশ্ন: এর কারণ কী? তাঁকে তো মনে করা হয় বাংলাদেশের অন্যতম বড় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক?

আবদুস সালাম: তিনি একজন বড় কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক হতে পারতেন। কিন্তু তিনি যখন এক্টিভিস্ট (কর্মী) হতে গেলেন তখনই তার পটেনশিয়ালিটি (সম্ভাবনা) নষ্ট হয়ে গেল। এজন্য উনার পার্টি সম্পর্কে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট (আগ্রহ) ছিল না। যেমন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির আবদুল মতিন, আলাউদ্দিনের সাথে বহু আলোচনা করেছি। আবদুল হক সাহেবের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। শান্তি সেনের সঙ্গে হয়েছে আলোচনা। তাঁদের মধ্যে আমি পুরোনো, গদবাঁধা বিষয়ই পেয়েছিলাম। নতুন চিন্তার বিকাশ বা দিশা তাদের মধ্যে আমি দেখিনি।

প্রশ্ন: দেবেন শিকদাররা?

আবদুস সালাম: দেবেনে শিকদাররাও তাই। এসব দল মার্কসবাদকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে নাই। দ্বন্দমূলক বস্তুবাদের সার বস্তুটাকে এরা বুঝতে পারে নাই। বুঝতে না পারার কারণে কোনো ব্যক্তি দায়ী নয়; সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এজন্য দায়ী। কারণ ওসব পার্টির নেতারা মার্কসবাদের মৌলিক বই-পত্র পড়ার সুযোগ খুব বেশি পান নাই।

প্রশ্ন: সম্ভবত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাঁদের অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছিল বলে তাঁরা মৌলিক কমিউনিস্ট লিটারেচার পড়বার এবং এবং সেসব অনুযায়ী পর্যালোচনার সুযোগ কম পেয়েছেন।

আবদুস সালাম: জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ব্যস্ত থাকলেও, মুক্তি সংগ্রামের একটা দিশা আছে তো! সে দিশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত চিন্তা থাকতে হবে। যেহেতু, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে বিশ্বের তিন জায়গায়; একটা হলো মস্কোতে, একটা ভারতবর্ষে, আরেকটা লন্ডনে। এই তিন গ্রুপের তিন ধরনের চিন্তাভাবনা। তিন গ্রুপের মধ্যে সমন্বয়টা হয়নি। আর ভারতে যারা কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সাবেক সন্ত্রাসবাদী ধারার লোক। সন্ত্রাসবাদী (উগ্র জাতীয়তাবাদী) চিন্তাধারার লোকদের দিয়ে একটা সুস্থ মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটানো খুবই কঠিন। যদিও তাঁদের ত্যাগের কোনো তুলনা নাই। প্রচুর ত্যাগ করেছেন। দেশ স্বাধীন করার জন্য তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করেছেন ... এই ত্যাগ আর এসব ব্যক্তিদের আমি সম্মান করি। তাঁদের এ ত্যাগকে আমি ওন (নিজের বলে ধারণ) করি, শ্রদ্ধাও করি। কিন্তু তাঁরা ভারত ভাগকে মেনে নিলেন। কেন? পাকিস্তান, হিন্দুস্থান আলাদা হওয়ার তো কোনো কারণ ছিল না। যদি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে তাঁরা 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের' জন্য একটা ডাক দিতে পারতেন, তাহলে তো হিন্দু-মুসলমানের এই প্রশ্নটা আসতো না। কিন্তু তা সে সময় তাঁরা করতে পারলেন না। ফেইল করলেন। তারপর যখন ব্রিটিশ তাড়ানো আন্দোলন হচ্ছে, কুইট ইন্ডিয়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, সে সময় ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঐক্যের নামে ব্রিটিশের পক্ষে চলে গেল কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির দায়িত্ব ছিল নিজ দেশে বিপ্লব করার, নিজ দেশের শত্রুদের পরাস্ত করে আন্তার্জাতিক ফ্যাসিবাদ দূর করার। কিন্তু তা না হয়ে পার্টি আন্তর্জাতিক উপনিপেশবাদের অনুগত হয়ে গেল। এটাতো ভুল! আজকে এসব ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে সমস্ত জনগণকে।

প্রশ্ন: এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তো আরো ভালোভাবে হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে আমরা আরো কয়েকটি ব্যক্তিগত বিষয় জানতে চাই। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করলেন কবে?

আবদুস সালাম: বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শুরু করেছি ১৯৭৩ সালে, আর কোর্স কমপ্লিট (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন) করতে সাত বছর লেগেছে। ১৯৮০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে বেশ কয়েকটি বড় আন্দোলন করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন: ওই সময় তো জিয়াউর রহমান ছাত্রদেরকে তাঁর দলে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং ছাত্র নেতাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তো আপনাকে কি কোনোভাবে প্রস্তাব করা হয়েছিল?

আবদুস সালাম: আমাকে কয়েকবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একবার ইস্তাম্বুল যাওয়ার জন্য। একবার মির্জা গোলাম হাফিজের মাধ্যমে আমার সঙ্গে বসতে চেয়েছেন আমি বসি নাই। আরেকবার এসএ বারির (তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী) মধ্যস্থতায় তাঁর সঙ্গে বসার কথা ছিল, সেটাও হয়নি। এ কারণে সে সময় আমাকে জেলে যেতে হয়েছে। ১১ মাস জেল খেটেছি।

প্রশ্ন: জেলে গেছেন কতবার?

আবদুস সালাম: ঐ একবারই।

প্রশ্ন: বিয়েশাদি কবে করেছেন?

আবদুস সালাম: মাস্টার্স পাশের পরপরই বিয়ে করেছি, ১৯৮০ সালে। বিয়ের কয়েকদিন পরেই জেলে যেতে হয়েছিল।

প্রশ্ন: এখনকার বাংলাদেশের (বামপন্থী রাজনৈতিক) সংগঠনগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে আপনার কাছে সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়?

আবদুস সালাম: তেমন সম্ভাবনাময় কোনো সংগঠন দেখি না। দেখলে, আমি সেই সংগঠন করতাম। এ মুহূর্তে এখন পর্যন্ত যে সংগঠনটির কিছু পটেনশিয়ালিটি (সম্ভাবনা) আছে তা গণসংহতি আন্দোলন। যদিও এর অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, তবুও বলব এ সংগঠনের একটি ফিউচার (ভবিষ্যৎ) আছে।

প্রশ্ন: আর যদি রাজনৈতিক ব্যক্তির কথা বলি তাহলে কাদের সবচেয়ে পটেনশিয়াল বলবেন?

আবদুস সালাম: এখন ভালো সংগঠক হিসেবে সেভাবে কারো নাম বলা যাবে না। যেমন সিরাজ শিকদার, বলা হয় খুব ভালো সংগঠক ছিলেন। কিন্তু ভালো সংগঠক হলে তিনি 'ওয়ান ম্যান পার্টির' কথা চিন্তা করতেন না। হক সাহেব, তোয়াহা সাহেব – এঁরা কেউ ক্যারিশমাটিক লিডার ছিলেন না। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো এদের ক্ষমতা ছিল না। এখন যেমন অনেকে বলছে জোনায়েদ সাকির মধ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো একটা জিল বা শক্তি আছে। কিন্তু আমি বলব যে, এটাও যথেষ্ট নয়। তারো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এটা জানতে পারলে সাকি হয়তো কষ্ট পাবে!

প্রশ্ন: আর মওলানা ভাসানীর ব্যাপারে...

আবদুস সালাম: অসাধারণ! তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা যদি তাঁকে বুঝতে পারতো যে উনি কী চাচ্ছেন! মওলানা কিন্তু তাদেরকে বুঝেছিলেন খুব ভালোভাবে। কমিউনিস্টরা কিন্তু তাঁকে বুঝতে পারেনি। ফলে এই যে গ্যাপ (দূরত্ব), এই গ্যাপের কারণে মওলানার সংগ্রামও শূন্য হয়ে গেল, আর কমিউনিস্টরাও শূন্য হয়ে গেল। এটা (সমাজতন্ত্র ও গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের) ইতিহাসে বড় ক্ষতি।

প্রশ্ন: দেবেন শিকদার তাঁর 'বাইশ বছরের গোপন জীবন: গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর' বইয়ে মওলানা ভাসানী প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, মাওলানা প্রকৃতপক্ষে কখনো চাননি যে বাংলাদেশে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আরোহন করুক?

আবদুস সালাম: এটা তাঁর নিজের অভিমত। এটা আসলে ঠিক না। তিনি হয়তো সে সময় মওলানাকে বুঝতে পারেননি। মাওলানা সমাজতন্ত্র চেয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রের জন্য তিনি অপরিসীম ত্যাগ করে গেছেন। তিনি যে ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলে গেছেন, তা ছিল হুকুমতে রব্বানি। হুকুমতে রব্বানির সাথে সমাজতন্ত্রের মৌলিক কোনো তফাৎ নাই। অর্থনৈতিক অবস্থা বা

শাসন কাঠামোর চিন্তা একই। একটা পার্থক্য আছে। সেটা ভাববাদে ও বস্তুবাদে। কিন্তু সেটা পরে মীমাংসার ব্যাপার। এখনই মীমাংসা করতে হবে, এমনটা নয়। সেটা বিপ্লবের পরে মীমাংসার ব্যাপার। সমাজে ভাববাদ প্রিভেইল (টিকে থাকবে) করবে নাকি বস্তুবাদ প্রিভেইল করবে, সেটা নির্ভর করছে সমাজের অগ্রগতির বা বিকাশের ওপরে। জোর করে কাউকে ভাববাদ থেকে মুক্ত করে বস্তুবাদী করা যাবে না।

মাওলানার এই বোঝাপড়া পরিষ্কার ছিল। আর যে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ জনগণ মুসলমান, যাদের হক-ইনসাফ নাই, যারা ইসলামকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িতের হাতিয়ার মনে করে ... সেটাকে কমিউনিস্টদের হাতিয়ার মনে করতে অসুবিধা কোথায় ছিল? কমিউনিস্টদের মুসলমান হয়ে যেতে হবে, এমনটা বলছি না। কিন্তু ইসলামের যে একটা গণতান্ত্রিক অ্যাপ্রোচ (দৃষ্টিভঙ্গী) ছিল, এই গণতান্ত্রিক এপ্রোচটাকে তো কমিউনিস্টদের কাজে লাগানো উচিৎ ছিল! দে ফেইলড টু ডু ইট।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো ধর্মপ্রশ্নটি একটি অসমাপ্ত আলোচনা নয় কী?

আবদুস সালাম: রিলিজিয়াস এপ্রোচটা বাংলাদেশের বামপন্থীরা এখন পর্যন্ত প্রোপারলি অ্যাড্রেস করতে পারে নাই।

প্রশ্ন: ধর্ম প্রশ্নটি আলোচনার জন্য বা এ বিষয়ে নিজেদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অবস্থান ঠিক করতে বাংলাদেশে কোনো বামপন্থী সংগঠন এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা-পর্যালোচনা করেছি কি? বা দেশীয় আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ বা বিশ্লেষকদের নিয়ে কোনো সভা, সেমিনার, গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে কি?

আবদুস সালাম: না। এ প্রসঙ্গে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা তারা করে নাই। নিজেরা যেমন বুঝছে, তাই লিখেছে, তাই বলেছে। যৌথ আলোচনা, যৌথ অধ্যয়ন, যৌথ চর্চার বিষয়টি এদেশের বামপন্থী পরিমণ্ডলের প্রায় সব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। পার্টিতে গণতন্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বলতে তারা কী বোঝে যৌথ কোনো

আলোচনার মাধ্যমে তা সুরাহা করার কোনো ইনিশিয়েটিভ (উদ্যোগ) তারা নেয়নি।

প্রশ্ন: এ প্রবণতা কি দলগুলোর নিজেদের তাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রেও একই রকম?

আবদুস সালাম: হ্যাঁ, সবকিছুতেই। (পার্টির) দলিল লিখে তো তিনজন মিলে! যতদূর পড়ে ... এক মত হলো, হয়ে গেল! তৈরি হয়ে গেল একটা দলিল।

প্রশ্ন: এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। জাতীয় নেতাদের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ কী?

আবদুস সালাম: শেখ মুজিব এমন একজন ব্যক্তি যিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। সে আন্দোলনের তিনি একজন কর্মী ছিলেন, প্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে যারা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিল, তাদের বড় অংশটা পরে আওয়ামী লীগ করেছে। কাজেই শেখ মুজিবর রহমান কোনো ভুঁইফোড় নেতা নন। তিনি নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যে নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তার অন্যতম কারণ ছিল বামপন্থীদের নানা ভুল। বামপন্থীদের ভুলের কারণে পুরো নেতৃত্ব তাঁর হাতে চলে গেছে। শ্রেণি বিবেচনায় শেখ মুজিবের ঐ জায়গায় যাওয়ার কথা নয়, তার শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতার জন্য। তারপরও ঘটনাক্রম তাঁকে শ্রেণি সীমাবদ্ধতার ঊর্দ্ধে নিয়ে গেছে।

তাঁর মধ্যে এক ধরনের হুইম (দোলাচাল) ছিল। তিনি কখনো সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ করেছেন, আবার সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব হয়েছে। কখনো মনে হয়েছে তিনি ভারতের কাছে আত্মসমর্পন করছেন, আবার কোনো কোনো ইস্যুতে তিনি ভারতের বিরোধিতাও করেছেন। তিনি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন কিন্তু স্টেট ম্যান হিসেবে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্র গঠনে শেখ মুজিবরের অবদান অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। যারা অস্বীকার করতে চাচ্ছে, তারা ইতিহাসের বিপরীতে গিয়ে কথা বলছে। শেখ মুজিব সম্পর্কে একটি যথাযথ মূল্যায়ন জাতির সামনে উপস্থিত করা উচিৎ।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সিপিবিই সবচেয়ে বড় সংগঠন। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামসহ জনগণের অধিকার আদায়ের নানা সংগ্রামে যুক্ত থাকার পরও দলটি কেন জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়াতে পারছে না বলে আপনার মনে হয়?

আবদুস সালাম: দাঁড়াতে পারেনি সিপিবি'র নেতৃত্বের শ্রেণিবিণ্যাসের কারণে।

প্রশ্ন: তার মানে আপনি কি এটা বলতে চাচ্ছেন যে নেতাদের শ্রেণি চরিত্রের কারণে এটা হয়নি? নেতাদের ডি-ক্লাশড হওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া থাকার কথা ছিল সেটা তাদের মধ্যে নাই?

আবদুস সালাম: না নাই। যেমন ধরা যাক তেভাগা আন্দোলন। দাবি হওয়া উচিৎ ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। কিন্তু দেখা গেল ফসলের তিন ভাগের মধ্যে দুইভাগ কৃষকদের দিতে হবে, এটাই হলো প্রধান দাবি। এটা ছিল পুরো একটা সংস্কারবাদী আন্দোলন। কৃষকদের এত ত্যাগ, কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের এত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এত বড় একটা আন্দোলন গড়ে উঠল, অথচ দেখা গেল আন্দোলনের ফলাফল শূন্য। তা এক সময় পার্টির জন্য বিপর্যয় নিয়ে আসলো। তাহলে কি হলো? কৃষকের যে দ্বন্দ্ব ছিল জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সে জমিদারতন্ত্রকে তারা রক্ষা করল। আর জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু, নেতারাও হিন্দু ছিল। কথাটা কমিউন্যাল (সাম্প্রদায়িক) হয়ে যায়, কিন্তু শেষ বিচারে ঘটনাটা এ-ই। এই নেতারা তখনকার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করেছে আন্দোলনটার মধ্যদিয়ে। আন্দোলনটাকে আমরা এখনো গ্লোরিফাই করছি তাতে কৃষক-জনগণের ত্যাগের কারণে। তাদের অত্যাচারিত হওয়া, নিষ্পেষিত হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনটা ছিল এ কারণে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনাদের অংশগ্রহণ ও জয় লাভের অভিজ্ঞতা আছে। সে প্রেক্ষিতে আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানতে চাই। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অধিকাংশই স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর এই দেশকে পুর্ণগঠনের জন্য, মানে যে কলোনিয়াল নিয়ামকগুলো ছিল সেগুলো থেকে দেশকে মুক্ত

করার জন্য, যে প্রোগ্রামগুলো নেওয়া উচিৎ বলে মনে হয়, যেমন ভূমি সংস্কার করা, শিক্ষা সংস্কার করা কিংবা এখানকার আইন বা প্রশাসন নতুন করে সাজানো, এই উদ্যোগগুলো নিয়ে কি কোনো বামপন্থী পার্টি আলোচনা করেছিল সে সময়ে?

আবদুস সালাম: স্বাধীনতা বলতে তারা এটুকুই বুঝেছিল যে দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করাই স্বাধীনতা। এই টুকুই! স্বাধীনতার স্বরূপটাকে তারা বুঝতে পারে নাই। স্বাধীন রাষ্ট্রটা কেমন হবে, তার রাজনীতি কেমন হবে, তার অর্থনীতি কেমন হবে, তার সংস্কৃতি কেমন হবে এ ধরনের কোনো চিন্তাভাবনা তারা করে নাই। তাদের ধারণা ছিল বিপ্লব হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: কিন্তু বিপ্লব কেমন করে হবে, সে বিষয়ে?

আবদুস সালাম: বিপ্লব কেমন করে হবে, তার প্রোগ্রামটা (কর্মসূচি) কী, কাজটা কী, জনগণ কেন বিপ্লব করবে, কেন বিপ্লব করতে উদ্বুদ্ধ হবে বা এজন্য জনগণের জন্য যে একটা কার্যকারি প্রোগ্রাম দরকার – এ সমস্ত ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি কখনো মনোযোগ দিতে পারে নাই।

প্রশ্ন: এতো লোক, এতো কর্মী, এতো ত্যাগ, বুদ্ধিজীবীরাও তো ছিল ... তারপরও পার্টি এসব ব্যাপারকে বুঝতে পারল না কেন?

আবদুস সালাম; ঐ যে বললাম সঠিকভাবে মার্কসবাদ বুঝতে না পারার কারণে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলছে সমাজের নির্দিষ্ট মুহূর্তে নির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব হচ্ছে প্রধান। এবং তাকে সল্‌ভ্‌ (নিরসন) করাটাই হচ্ছে কমিউনিস্টদের দায়িত্ব। সমাধান করার জন্য যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী, সংগতিপূর্ণ কর্মসূচী নিতে হবে, এটা তারা বুঝতে পারেনি।

প্রশ্ন: আরো দুটি বিষয়ে জানতে চাই। বিভিন্ন সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নারী-পুরুষের সম্পর্ক। এই ইস্যুতে বিভিন্ন পার্টিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যা হয়েছে, এই নিয়ে কার্যকর কোনো আলোচনা কেউ করেছে কি না বা করা উচিৎ কি না?

আবদুস সালাম: না, এরা নারী- পুরুষের সম্পর্কটাকে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছে। কিন্তু এটা যে মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সাথে সম্পর্কযুক্ত, শ্রেণির সংগ্রামের সাথে সম্পর্কযুক্ত এটা ভেবে দেখে নাই।

প্রশ্ন: তাহলে কি আপনি নারীবাদ এবং মানুষের মুক্তি সংগ্রামে 'নারী' প্রশ্নটাকে আলাদা করতে চাইছেন?

আবদুস সালাম: (কমিউনিস্ট আন্দোলণে) নারীবাদ বলতে আসলে পৃথক কিছু নাই। এটা একটা পশ্চিমা অভিধা, একটা ফ্যাশনেবল মুভমেন্ট। এটার সাথে শ্রেণিমুক্তির কোনো সম্পর্ক নাই।

প্রশ্ন: কিন্তু বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটা বড় অংশ তো এখন নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী 'নারীদের' সমস্যা সমাধানের কথা বলছে।

আবদুস সালাম: তারা মার্কসবাদী হওয়ার অর্থও হয়ত ঠিক করে বোঝে না।

প্রশ্ন: মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনি নারী প্রশ্নকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

আবদুস সালাম: মার্কস পরিস্কার করে বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণি অন্যান্য শ্রেণিকে মুক্ত না করে নিজে মুক্ত হতে পারবে না। তাহলে শ্রমিক শ্রেণির দায়িত্ব হলো অন্য শ্রেণিকে আগে মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এর মধ্যে দিয়েই নিজের মুক্তি নিশ্চিত করা। নারীরা তো শ্রমিক। আলাদা তো কোনো আইডেনটিটি নেই, বায়োলোজিক্যাল ফেনোমেনন ছাড়া। সেও শ্রম দেয়, সেও উৎপাদন করে। অতএব তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে নারী-পুরুষের বিভেদ সৃষ্টি করাটা হলো কায়েমি স্বার্থবাদীদের কাজ। নারী-পুরুষ উভয়ের মিলিত সংগ্রামই হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রাম। মুক্তির সংগ্রাম।

মার্কসবাদ এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে নারীকে তার মুক্তির জন্য তার শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। সে কোন শ্রেণির? শ্রমিক শ্রেণির, মেহনতি মানুষের। সে মেহনত করে খায়। এর বাইরে তার আলাদা কোনো পরিচয় নাই, যেটুকু

আছে সেটা হলো বায়োলজিক্যাল পরিচয়। কিন্তু সেটা সংগ্রামের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

এদেশে যারা (বামপন্থীরা) নারীমুক্তির আন্দোলন করে, মানে শ্রমিক আন্দোলনের নারী নেত্রীরা, তারা কেউ পর্যাপ্ত পড়াশোনা করে না। না রোজার, না কোলন্তাইয়ের না অন্য কারো। কোলনতাইয়ের কিছু লেখা বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। যে তিনটি লেখার অনুবাদ দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে ওতে বেশ সমস্যা আছে।

প্রশ্ন: কিন্তু সেগুলোই তো বেশি পাঠ্য।

আবদুস সালাম: ধুর, ওগুলো কিছু ফ্যাশনেবল মহিলা পড়ে থাকে। এখন তো দেখি নারীরা শ্রমজীবী নারীদের মাঝে কাজই করতে চায় না! আর তারা যদি শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে কাজ না করে, তবে নারীমুক্তির আন্দোলন করবে কিভাবে?

প্রশ্ন: যারা শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে কাজ করছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?

আবদুস সালাম: তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিষ্কার নয়।

প্রশ্ন: বামপন্থী নারীবাদীদের অনেকেই এখন মনে করছেন যে, ইতিহাসে লেনিন বা কার্ল মার্কসের জায়গায় ক্লারা জেটকিন, রোজা লুক্সেমবার্গ বা আলেজান্দ্রা কোলনতাই যেতে পারেনি পুরুষদের চক্রান্তের কারণে। এ প্রশ্নটিকে আপনি কিভাবে মোকাবিলা করবেন?

আবদুস সালাম: এটা কোনো চক্রান্তের ব্যাপার না। সব মানুষের প্রতিভা, যোগ্যতা সমান না। সমান নয় বলেই ইতিহাসে ওটা ঘটেছে। নারী বলে নেগলেক্ট (উপেক্ষিত) হয়েছে, নারী বলে ভোট পায়নি, নারী বলে কাউকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এ রকম ঘটনা কোথাও (কোনো বামপন্থী পার্টিতে) ঘটেনি, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিতেও নয়।

প্রশ্ন: কিন্তু ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায়ে নারীরা ভূমিকা রাখতে পারে নাই তার কারণ অবশ্যই এটা যে সমাজে একটা শক্ত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এবং সেটা এখনও বিদ্যমান।

আবদুস সালাম: সমাজে তো সেটা সব সময়ই আছে।

প্রশ্ন: তাহলে তো নারীদের ফাইট করার প্রশ্নটি থাকছেই ... এবং এখন পর্যন্ত ক্লারা জেটকিনদের পার্টিতে সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় না!

আবদুস সালাম: সেই ফাইটটা তো নারীর একার ফাইট না। সেটা নারী-পুরুষের যৌথ লড়াই। নারীরা যখন একা লড়াই করতে গেছে, তখনই ভুল পথে গেছে।

প্রশ্ন: পুরুষরা যখন (নারীদের সাহায্যে এগিয়ে) আসেনি, তখন নারীদের তো একাই ফাইট করতে হবে! আর সেটাই তো হচ্ছে!

আবদুস সালাম: পুরুষেরা আসে নাই, এই কথাটা আমি মানতে পারছি না। মানতে পারছি না এই জন্য যে, পুরুষ মানে কী? সে একজন কমিউনিস্ট। তার দায়িত্বই তো হচ্ছে সমগ্র শ্রেণিকে মুক্ত করার জন্য ভূমিকা পালন করা। তো সে আবার নারী-পুরুষের বিবাদ করে নারীকে দূরে সরিয়ে রাখবে কেন? এটা একটা ভুল ব্যাখ্যা, বা কেউ হয়ত ভুল বুঝেছে। বলা যায়, হয়তো পুরুষেরা (নারী আধিকারের ইস্যুটিতে) মনোযোগ কম দিয়েছে। এই জায়গাটাকে (নারীর মুক্তির জন্য নারী-পুরুষের যৌথ সংগ্রামকে) বাদ দিয়ে আমি শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির কথা বলতে পারি না।

প্রশ্ন: দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি করতে চাই তা হলো পার্টি গঠনের বিষয়ে। বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, গুটিকয় লোকের সিদ্ধান্তে পার্টি গঠিত হচ্ছে। আন্দোলন সংগ্রাম থেকে গড়ে ওঠা নেতাদেরকে নিয়ে, নিচ থেকে গড়ে উঠা সংগঠন ও তৎপরতার ভিত্তিতে, সবার সাথে 'এখনই পার্টি গঠন করার প্রয়োজন আছে কি না' সেটা আলোচনা করে, তারপর পার্টি গঠন করা – এমনটা আমরা দেখি না কেন?

আবদুস সালাম: এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার ক্ষেত্রে এটাকেই আমি বলবো প্রধান দুর্বলতা। শ্রমিক শ্রেণি প্রয়োজন বোধ করছে কিনা যে তার পার্টি লাগবে। যখন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি নিজে উপলব্ধি না করছে যে তার নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন দরকার, ততক্ষণ বাইরে থেকে লোড চাপিয়ে দিলে হবে না। দ্বিতীয়ত, দেখা গেছে আমাদের এখানে পার্টি হয়েছে। পাঁচজন লোক মিলে একটা দলিল তৈরি করেছে, একমত হয়েছে, আর নিজেদের ঘোষণা করেছে পার্টি। কিন্তু পার্টি গড়ে তোলার জন্য যাদের পার্টি (শ্রমিক শ্রেণি) তাদের এখানে অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। তারা মনে করে (শ্রমিকরা) পরে অংশগ্রহণ করলেই চলবে। কিন্তু দ্যা প্রসেস ওয়াজ রং।

উদাহরণ হিসেবে, চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল কোথায়? গড়ে উঠেছিল কুওমিনতাঙ পার্টির মধ্যে। কুওমিনতাঙ ছিল একটি জাতীয়তাবাদী পার্টি। ন্যাশনালিস্ট পার্টি। সে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ন্যাশনাল ইস্যুতে মুভমেন্ট করছে। কিন্তু ন্যাশনাল মুভমেন্টের সীমাবদ্ধতার কারণে মাও সেতুং এবং তার কম্পেনিয়নরা (চেন দুজিউ ও লি দাজাও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২১ সালে। পার্টির প্রতিষ্ঠাকালে মাও সে তুং অন্যতম অঞ্চলিক নেতা হিসেবে যুক্ত ছিলেন) দেখল যে, ওই পার্টি দিয়ে চায়নাকে মুক্ত করা সম্ভব না, নতুন পার্টি দরকার। তখন তারা নতুন প্রসেস শুরু করে উইথ ইন দ্যা পার্টি। কাদেরকে নিয়ে? ওই পার্টির (কুওমিনতাঙ) যারা লড়াকু অংশ তাদেরকে নিয়ে। যে লড়াই করে নাই, আসে না, জানে না, কিছুই করে না, তাদেরকে ধরে নিয়ে তো পার্টি গঠন করা যায় না। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিও একই পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছিল। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির পাঁচ টি গ্রুপের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। আর এর লড়াকু অংশকে নিয়ে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি। আর এই পার্টি কখন হয়েছে? হয়েছে বিপ্লবের পর। আলবেনিয়াতে হয়েছে বিপ্লবের পর, কিউবাতে বিপ্লবের পরে পার্টি হয়েছে। সুতরাং,পার্টির ঘোষণা দিলেই হয় না।

প্রশ্ন: কিন্তু বাংলাদেশে এই ইতিহাসগুলো তো আমাদের অজানা নয়।

আবদুস সালাম: অজানা। পার্টি গড়ার কোনো লিখিত বা প্রামাণ্য ইতিহাস (বা এর চর্চা এদেশে) নাই। কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদের লেখা পড়লে দেখা

যায়, তিনি বলছেন, আমরা কমিউনিস্ট পার্টির কাজ শুরু করলাম মার্কসবাদ সম্পর্কে ভাষাভাষা জ্ঞান নিয়ে। আর যাই-ই হোক ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি শুরু করা যায় না। একটা সিদ্ধান্তই যথেষ্ট (পুরো পরিস্থিতি বোঝার জন্য)। উনারা (কমিউনিস্ট নেতাকর্মীরা) আজীবন বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কিন্তু উনারা যে সত্যভাষণ করেছেন, যে মার্কসবাদ নিয়ে ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে উনারা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে গেছেন, এটাই হয়েছে সর্বনাশের মূল কারণ। পরবর্তী সময়ে উনারা কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টাও করেন নাই। একদিকে মোজাফ্ফর আহমেদ ওদিকে রনদীভে, অন্যদিকে ডাঙ্গে। এই প্রসঙ্গে একটু বলি। ডাঙ্গে নেতা হলো কেমন করে? ট্রেড ইউনিয়ন করে। অথচ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ভারতীয় কংগ্রেসের স্বার্থ রক্ষা করেছে। ফলে শাস্ত্রীর মতো লোক, গোপালাচারী বা ভিভিগিরির মতো প্রখ্যাত শ্রমিক নেতারা কংগ্রেসের নেতা হয়েছেন। বামপন্থী নেতা হননি।